MAQAM : Center For Sufi Heritage

কোহিনূর ম্যানশন-৩, শ্যামলী আ/এ, সুন্নিয়া মাদ্রাসা রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২০৩

হজরত শাহজালাল মুজাররদ (রহ.): আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

মুহাম্মদ সৈয়দুল হক

কি-ওয়ার্ড: জালেম, মজলুম, দরবেশ, সুফি, অধ্যাত্ম, রাজনীতি

পারিভাষিক ব্যাখ্যা:

সুফি: সুফ তথা পশম থেকে সুফি শব্দটি এসেছে। প্রাচীন সুফিরা মোটা পশমের কাপড় পরতেন, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগের প্রতীক হিসেবে। আবার আরবি সাফা তথা পবিত্রতা থেকেও এসেছে বলে মত পাওয়া যায়। অন্তরের পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের স্বচ্ছতা অর্থে। আরেকটি প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে আহলুস সুফফা তথা মসজিদে নববীতে সারাক্ষণ অবস্থানকারী সাহাবিদের নাম থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি। পরিভাষায় সুফি হলেন তিনি, যিনি নিজের নফসের কামনা-বাসনা দমন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেন, জাগতিক মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হন এবং সর্বদা আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন।

দরবেশ: ফারসি দারভিশ থেকে এসেছে। আক্ষরিক অর্থ ফকির, দরিদ্র, অভাবী। কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় দরবেশ মানে কেবল বস্তুগত দারিদ্র নয়, বরং আল্লাহর দরবারে নিজের দারিদ্র ও অসহায়ত্বকে স্বীকার করা। অর্থাৎ, দরবেশ হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি জাগতিক ভোগ-বিলাস ও ধন-সম্পদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন, আল্লাহর কাছে সর্বদা অভাবী ও মুখাপেক্ষিতার জায়গা থেকে আশ্রয়ের বাসনায় মশগুল থাকেন এবং ফক্‌রের (আধ্যাত্মিক দারিদ্র) মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করেন।

অধ্যাত্ম: সংস্কৃত অধি + আত্ম থেকে এসেছে। আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞান বা সাধনা অর্থে। অধ্যাত্ম হলো আত্মা, চেতনা ও অন্তরের জগৎকে কেন্দ্র করে সাধনা ও জ্ঞানের সেই শাস্ত্র, যা মানুষকে আত্ম-পরিচয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত সত্য (পরম সত্তা/আল্লাহ) উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। ইসলামি পরিভাষায় একে বলা হয় তাজকিয়া (আত্মশুদ্ধি) বা তাসাউফ, যা মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর নৈকট্যে অন্যতম পৌঁছানোর পথ।

সতর্কতা: আউলিয়ায়ে কেরামের নামের পর 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলার রেওয়াজ রয়েছে। পাঠের সুবিধার্থে প্রবন্ধের সবখানে এই রেওয়াজের প্রয়োগ হয়নি। এ বিষয়ে পাঠকের সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সতর্কতা একান্ত কাম্য।

ভূমিকা:

বাংলায় ইসলাম প্রচারে এবং সুফি-দরবেশদের মাঝে হজরত শাহজালাল মুজাররদ (রহ.) সর্বাধিক সফল, স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ। তিনি তৎকালীন গৌড় তথা পরবর্তীতে শিলহট, পর্যায়ক্রমে শ্রীহট্ট কিংবা আজকের সিলেট অঞ্চলের একজন ইসলাম প্রচারক দরবেশ হিসেবে সুপরিচিত। এ-ছাড়াও তিনি একাধারে জগদ্‌বিখ্যাত সুফি, সমাজ-সংস্কারক এবং যোদ্ধা। গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই তাঁর সিলেট-জীবন শুরু হয়। এ যুদ্ধে তিনি জালিমের বিরুদ্ধে এবং মজলুমের পক্ষে অবস্থান নিয়ে জুলুম-বিরোধী সুফিচেতনার ঐতিহাসিক পরম্পরায় ইতিহাসের নবদিগন্ত উন্মোচন করেন। সিলেট বিজয়ের পর তিনি একদিকে খানকায় বসে আধ্যাত্মিক কার্যাবলি সম্পন্ন করেছেন, অপরদিকে তাঁর অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনায় সিলেট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তি মজবুত হয়েছে। তাঁর অনুসারী দরবেশ তথা বিখ্যাত ৩৬০ আউলিয়ার কেউ কেউ নিকটবর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি অবতীর্ণ হয়েছেন শাসকের ভূমিকায়। অর্থাৎ, বাংলার শাসন ও রাজনীতিতে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রাথমিক পরিচিতিঃ

হজরত শাহজালাল'র পূর্ণ নাম শেখ জালাল উদ্দিন জালাল উল্লাহ। পিতা- মোহাম্মদ বিন ইব্রাহীম কোরাইশি। তিনি সংগ্রামী যোদ্ধা ছিলেন এবং কোনো এক ধর্মযুদ্ধে শহিদ হন বলে বর্ণনা রয়েছে। মাতা- ফাতেমা হাসিনা সাইদা।[১] তাঁর জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সৈয়দ মুর্তজা আলী মনে করেন, তিনি তুরস্কে জন্মেছেন।[২] আবার সরে কওম আলী মাহমুদ খান তাঁর *প্রাচ্যসূর্য হযরত শাহজালাল (রহ.)* বইতে এবং মুফতি আজহার উদ্দিন সিদ্দিকী তাঁর *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি* বইতে জোরালোভাবে দাবি করেছেন, তিনি ইয়ামেনে জন্মগ্রহণ করেছেন। শাহজালালের জীবনীর উপর সর্বাধিক গবেষণাকারী দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চোধুরীও এ মতের পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন।[৩] কিংবদন্তিমূলেও তাঁর নামের সাথে ইয়ামেনি শব্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিতর্ক আছে শাহজালালের জন্মসন নিয়েও। ইবনে বতুতা তাঁর রিহ্লায় শাহজালাল ১৫০ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] সে হিসাবে তাঁর জন্ম হবার কথা ১২০০ সালের দিকে। আবার প্রসিদ্ধ মতে তাঁর জন্ম ১২৭৬ সালে। তাঁর তরিকা নিয়েও দুটি মত পাওয়া যায়। *গুলজারে আবরার* কিতাবের ভাষ্যে তিনি নকশবন্দীয়া তরিকার মুরিদ, আবার *সোহেলে ইয়ামেনি*'র বর্ণনায় তাঁর পীর সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.) এবং তিনি সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের মতো পণ্ডিতরা শেষোক্ত মতকে সমর্থন করেছেন।[৫] তাঁর পীর সম্পর্কেও দুটি মত পাওয়া যায়। প্রথমত তাঁর মাতুল সৈয়দ আহমদ কবির, দ্বিতীয়ত সৈয়দ আহমদ ইয়াসভি (রহ.)। তবে তাঁর জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পিতা-মাতা উভয়ে ইন্তেকাল করলে তাঁর দায়িত্ব নেন মাতুল সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.)। তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে বড়ো করে তোলেন এবং একজন প্রকৃত দরবেশরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট থাকেন। সৈয়দ আহমদ কবিরের পৈত্রিক নিবাস ছিল অবশ্য বর্তমান পাকিস্তানের মুলতানে। তাঁর পিতা বিখ্যাত সাধক সৈয়দ জালালুদ্দিন সুরখ বোখারি (রহ.)। তাদের আদিনিবাস ছিল বোখারায়। পরে তাঁরা মুলতানে এসে স্থায়ী হন। সৈয়দ আহমদ কবিরের মক্কায় যাবার উদ্দেশ্য ছিল সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার প্রচার-প্রসার। এ থেকে সহজেই অনুমেয়, সৈয়দ আহমদ কবির-ই শাহজালালের পীর তথা আধ্যাত্মিক গুরু।

হজরত শাহজালাল (রহ.)'র বাংলায় আগমনের প্রেক্ষাপটঃ

হজরত শাহজালাল (রহ.)'র বাংলায় আসার প্রেক্ষাপট বেশ চমকপ্রদ। তিনি যে স্বপ্রণোদিত হয়ে এই অঞ্চলে এসেছেন তা নয়; বরং তাঁর এই সফর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে মহান আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা। এই অঞ্চলে তাঁর আগমনের কারণ হিসেবে একটি স্বপ্নের কথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। স্বপ্নটি হলো, "পরম কারুণিক পরমেশ্বর রহমানুর রহীম আল্লাহ তা'লার ইচ্ছা– তুমি ভারত খণ্ডের পূর্ব সীমায় ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীন করিবে এবং স্বীয় কীর্তি চিরস্মরণীয় করিবে। সত্বর পূর্বদিকে রওয়ানা হও। স্বীয় মাতৃভূমিতুল্য ভূমি যে স্থানে পাইবে সেই স্থানেই বসতি করিবে।"[৬]

অন্য বর্ণনায় দেখা যায়, একদিন এক হরিণ শাবক বাঘের তাড়া খেয়ে হঠাৎ সৈয়দ আহমদ কবিরের ঘরে ঢুকে পড়ে এবং বাঘের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট নালিশ পেশ করে। ক্ষণিকের ভাবনায় হজরত আহমদ কবির, হজরত শাহ জালালের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরীক্ষা করতে উদ্যোগী হলেন। তিনি শাহ জালালকে বাঘের ব্যাপারটি মীমাংসা করে আসতে আদেশ করেন। আদেশ মতো শাহ জালাল বাঘটির গালে চপেটাঘাত করলে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় সেটি পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ কথা যখন সৈয়দ আহমদ কবিরের নিকট বর্ণনা করা হয়, তখন তিনি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠেন, "তোমার আধ্যাত্মিকতা চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, আমার এবং তোমার হৃদয় এক হইয়া গিয়াছে। তোমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা চলে না। অতএব যাও, ভারতে ইসলাম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত কর।' অতঃপর, হোজরা হইতে একমুষ্টি মৃত্তিকা তাঁহার হাতে দিয়া আদেশ দিলেন, যে জায়গায় এরূপ বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদবিশিষ্ট মৃত্তিকা পাওয়া যাইবে, তথায় অবস্থান করিও।"[৭] এ উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয় যে, শাহজালাল (রহ.) বাংলায় আসার অদ্বিতীয় কারণ– এই অঞ্চলে ইসলামি ঝাণ্ডা উড্ডীন করা। যার সহজ অর্থ করলে দাঁড়ায়, এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং শাসনব্যবস্থায় নীতি-নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে বিশেষ মিশন দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে।

---

[১] প্রাচ্যসূর্য হযরত শাহজালাল (রহ.): আলী মাহমুদ খান, আল-জালাল প্রিন্টার্স, দরগাহ গেইট, সিলেট, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৪-৫

[২] হজরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস: সৈয়দ মুর্তজা আলী, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৪

[৩] শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি: মুফতি আজহার উদ্দিন সিদ্দিকী, মদন মোহন কলেজ সাহিত্য পরিষদ, সিলেট, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৮

[৪] The Travels Of Ibn Battuta (1325-1354, Volume IV): H. A. R. Gibb and C. F. Beckingham, THE HAKLUYT SOCITY, LONDON, 1994, page 874

[৫] ইসলাম প্রসঙ্গ: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৯০
বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব: ড. মুহম্মদ এনামুল হক, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ৭২

[৬] শ্রীহট্ট-নূর: আবদুর রহিম, ১৯০৫– সূত্র: জালালাবাদের কথা: দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ১৪

[৭] সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮

হজরত শাহজালাল'র আধ্যাত্মিক পরিক্রমা

পরিচিতি পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হজরত শাহজালাল'র পিতা-মাতা ছিলেন পরহেজগার বা তাকওয়াবান। পিতা মোহাম্মদ বিন ইবরাহীম কোরাইশি একজন বীর মুজাহিদ, মাতা ছিলেন বিদগ্ধ সাধক জালাল উদ্দিন সুরখ বোখারি'র কন্যা। বলাবাহুল্য, শিশুর ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার পরহেজগারিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও সন্তানের মাঝে পিতা-মাতার স্বভাব, বৈশিষ্ট থাকার কথা স্বীকার করা হয়েছে। পিতা-মাতার গুণ এবং দোয়ার কারণে সন্তানের সত্তার মাঝে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ প্রতিফলিত হওয়ার ইতিহাস অপ্রতুল নয়। আবু সালেহ মুসা জঙ্গি এবং উম্মুল খায়ের ফাতেমার মতো বিদগ্ধ সাধকদের মাধ্যমে দুনিয়ায় এসেছিলেন হজরত আবদুল কাদের জিলানির মতো জগদ্‌বিখ্যাত শায়খুল মাশায়েখ। আবার মায়ের দোয়ার বরকতে হজরত বায়েজিদ বোস্তামির খ্যাতিও বিশ্বজোড়া। সুতরাং, পিতা-মাতার আধ্যাত্মিক গুণাবলি দ্বারা হজরত শাহজালাল মায়ের গর্ভ থেকেই অধ্যাত্ম গুণে গুণান্বিত হয়ে পৃথিবীতে আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এছাড়াও তিনি ছোটোবেলায় মা-বাবা হারানোর পর যাঁর তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন তিনি তাঁর মাতুল সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দি (রহ.)। যিনি ছিলেন সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার প্রাণপুরুষ। যাঁর মাধ্যমে পবিত্র ভূমি মক্কা নগরিতে সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার বিকাশ সাধিত হয়েছিল। অতএব তাঁর অধীনে বেড়ে উঠার সুবাদে একদম ছোটোবেলা থেকেই তিনি অধ্যাত্ম সাধনার পথে বিশেষভাবে পরিচালিত হয়েছেন। দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর বর্ণনায় এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "শাহ্ জালালের বাল্যকালেই তদীয় পিতামাতা ইন্তেকাল করেন। তাহার মামা সৈয়দ আহমদ কবীর (র.) মক্কা শরীফের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ বজুর্গ আলিম ছিলেন। অল্প বয়সে এতিম হইয়া পড়ায় শাহ্ জালালের (র.) লালন পালন ও শিক্ষাদীক্ষার ভার তদীয় মামা সৈয়দ আহম্মদ কবীরের উপর ন্যস্ত হয়। তাঁহার তত্ত্বাবধানে শাহ্ জালাল (র.) কুরআন, হাদিস, ফেকাহ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর তাঁহার নিকটেই ইলমে মারফত বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা হাসিল করেন। তখন হইতেই তিনি অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হন।"[৮]

পরবর্তী জীবনেও তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের বিভিন্ন নজির পরিলক্ষিত হয়। বাংলায় আগমনের প্রাক্কালে তিনি মাতৃভূমি ইয়ামেন হয়ে রওনা হন। এরপর ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, বর্তমান পাকিস্তানের মুলতান কিংবা বর্তমান ভারতের দিল্লি, সর্বত্র সফর করেছেন। নানান পীর-ফকির তথা দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। মাতৃভূমি ইয়ামেন হয়ে যখন তিনি এই সফরের সূচনা করেছিলেন, ততদিনে তাঁর সুখ্যাতি ইয়ামেনে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থানীয়রা তাঁকে নিয়ে এতই উৎসাহী ছিলেন যে, তৎকালীন স্থানীয় সামন্ত রাজাই সিংহাসন নিয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। যার ফলে শাহজালাল'র শরবতে বিষ মিশিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে রাজা নিজেই ধরাশায়ী হন। একদিকে বিসমিল্লাহ বলে বিষ পান করেও শাহজালালের কোনো ক্ষতি হয়নি, অপরদিকে পানি পান করে বিষাক্রান্ত হয়ে মারা যায় রাজা। কবিতায় যেমনটি এসেছে–

"ইয়ামনি বাদশাহ জহরের জাম দিয়েছিল তুলে হাতে
পরখ করতে তাঁহার গুণ-কারামতে
হাতে নিতে নিতে শহদ হল যে বিছমিল্লার বলে
শহদ পিয়েও জহরী তাছিরে বাদশা পড়ল ঢলে
হায়াত মউত জহর শহদ এক যার কাছে
ভাবতে পারে না আর কিছু এক ছাড়া
তবে আর কেন পরখ করার এতটা ইমতিহান
সেই ওয়াহদাতে ওজুদে একক করেছে যে দেহপ্রাণ ।"[৯]

বাংলায় আগমনের পথে দিল্লিতে অবস্থানকালে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সাথে তাঁর যে ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ, সেখানেও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় মেলে। ঘটনাটি ছিল এমন– শাহজালাল (রহ.) দিল্লিতে পৌঁছে এক জায়গায় তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কাছে খবর দেন যে, ইয়ামেন থেকে এক দরবেশ এসেছেন, তিনি দৃঢ়ভাবে নারীসঙ্গ এড়িয়ে চলেন, সর্বক্ষণ চেহারায় একটি কাপড় দিয়ে রাখেন। এক যুবকের সাথে তাঁর অন্যরকম ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করা গেছে। এই সংবাদ শুনে হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.) একজন খাদিম পাঠালেন হজরত শাহজালালের কাছে। খাদিম তাঁর কাছে যেতেই খাদিমের হাতে একটি কৌটো এগিয়ে দিয়ে বলেন, এটি আপনার মুরশিদের হাতে পৌঁছে দিন। অতঃপর খাদিম

[৮] চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১
[৯] খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরবারে আসার পর কৌটো খুললে দেখা যায় জ্বলন্ত একটি কয়লাখণ্ড তুলার উপর জ্বলজ্বল করছে; অথচ তুলার একটি অংশকেও সে আগুন স্পর্শ করেনি।[১০]

এসব ঘটনা আমাদের একটি পরিষ্কার ধারণা দেয় যে, শাহজালাল (রহ.) বাংলায় আসার পূর্বেই একজন পরিপূর্ণ সুফি তথা ইনসানে কামেল হিসেবে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। নতুবা গোপনে দেওয়া বিষের খবর যেমন তাঁর অজানা থাকার কথা, তেমনি জ্বলন্ত কয়লা তুলোকে দগ্ধ করবে না– এমনটিও হবার কথা নয়। আবার তাঁর সঙ্গে যে বিশেষ যুবকের ঘনিষ্ঠতার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে তিনি যুবরাজ শেখ আলী। ইয়ামেনের সে রাজার সন্তান, যে শাহজালালকে পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরাশায়ী হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর শাহজালালের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে তিনি শাহজালালের সঙ্গী হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চলে আসেন ভারতবর্ষে। আধ্যাত্মিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন।

এভাবে তাঁর জীবনে বহুবিধ কারামতের নজির বিদ্যমান। সিলেট জয়ের পথে জায়নামাজ বিছিয়ে নদী পার হবার কথা লোকমুখে এখনো প্রচলিত। বিভিন্ন ছড়া, গান কিংবা পুঁথিতেও এসব বর্ণনা উঠে এসেছে। তাঁর বিশেষ কয়েকটি কারামতের সাথে পৃথিবী-বিখ্যাত মুসাফির ইবনে বতুতাও সরাসরি যুক্ত। বিশেষত, তিনি যখন শাহজালালের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলেন, তখন দুদিনের রাস্তা বাকি থাকতেই পথিমধ্যে শাহজালালের চারজন খাদিম এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তাদের বর্ণনা মতে ইবনে বতুতা যে শাহজালালের কাছে যাচ্ছিলেন তিনি সেটি আগে থেকেই জানতে পেরেছেন। এবং জানতে পেরে চারজন শাগরেদ পাঠিয়েছেন তাঁকে অভ্যর্থনার মাধ্যমে গ্রহণ করতে। শাহজালালের আধ্যাত্মিক প্রসিদ্ধির নজির এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ভুবনবিখ্যাত একজন পর্যটক কেবলই শাহজালালের সাথে দেখা করতেই বাংলায় এসেছিলেন। নতুবা তাঁর গন্তব্য ছিল চীন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় আরও দেখা যায়, শাহজালালের বিশেষ জোব্বা ইবনে বতুতার মাধ্যমে হাতবদল হয়ে চীনের বুরহান উদ্দিন সাগরজির কাছে পৌঁছলে তিনি ইবনে বতুতাকে জানান যে, শাহজালাল (রহ.) আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে প্রতিদিন ফজরের নামাজ পবিত্র কাবা শরিফে আদায় করেন এবং প্রতি বছর ৯-১০ জিলহজ হজ সম্পাদন করেন। সচরাচর এ-সময় তাঁকে তাঁর হুজরায় পাওয়া যেত না। অদৃশ্য হয়ে যেতেন।[১১]

কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মূলে এসবের চেয়েও বড়ো উদাহরণ রয়েছে তাঁর ব্যক্তিজীবনে। ইবনে বতুতা তাঁর সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, তিনি একাধারে চল্লিশ বছর যাবত রোজা পালন করেছেন এবং রাত জেগে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। প্রতি দশদিন অন্তর আহার করতেন। এ থেকে বোঝা যায়, ব্যক্তি শাহজালাল প্রতিনিয়ত খোদা তায়ালার আরও নিকটে যাওয়ার সাধনায় আমরণ লিপ্ত ছিলেন। আল্লামা ইকবাল এই বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন–

খুদি কো কর বুলন্দ ইতনা কে হার তাকদির ছে পেহলে
খোদা বান্দেছে খোদ পুঁছে– বাতা তেরি রেজা কিয়া হ্যায়?[১২]

আর এই অবিচল সাধনধারাই মূলত তাঁর সবচেয়ে বড়ো কারামত। কারণ, সাধনার এই পথে বহু বিখ্যাত জনের পদচ্যুতির নজির ইতিহাসে বর্তমান। খোদার পথে একনিষ্ঠভাবে অবিচল থাকার যে মহান ব্রত, শাহজালাল (রহ.) তা অটুট রেখেছিলেন ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত।

এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খোদা তায়ালা থেকে অল্প সময়ের জন্যও মনোযোগ বিনষ্ট না হওয়ার জন্য তিনি নিজের জৈবিক চাহিদাকেও কুরবানি দিয়েছিলেন। তাই তাঁর জীবনে বিয়ে-শাদির অধ্যায় দেখতে পাওয়া যায় না। 'মুজাররদ' শব্দটি তাঁর নামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, তাসাউফের পরিভাষায় মুজাররদ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যিনি খোদার পথে এমনভাবে পরিচালিত হয়েছেন যে, তিনি দুনিয়া-আখিরাতের সমস্ত চাহিদা থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত। সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার প্রাণপুরুষ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি'র বিখ্যাত কিতাব *আওয়ারিফুল মায়ারিফে* 'তাজরিদ' শব্দের দুটি অর্থ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাহ্যিকভাবে দুনিয়াবি খায়েশ মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ, দুনিয়ার মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া। এটার মধ্যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় অন্তর্ভুক্ত। কোনো কিছু দেখার, শোনার, খাওয়ার, শোঁকার কিংবা ত্বকের অনুভূতি নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ। ইহকাল ও পরকালের প্রতিদানের আশা থেকে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ, স্রেফ আল্লাহ-মুখী হয়ে যাওয়া, আল্লাহকে চাওয়া। বিনিময়ে কিছু পাবার আশায় বা কিছু থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্য ত্যাগ করে শুধু

[১০] আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮-৯

[১১] Gibb and Beckingham, ibid

[১২] বা-ঙ্গে দা-রা, নজমে খুদি: আল্লামা ইকবাল রহ. শের নং ৬৩

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবনকে উৎসর্গ করা। যে সত্যিকার অর্থে এই চাওয়া-পাওয়ার হিসাব থেকে মুক্ত হতে পারে, তিনিই মুজাররদ স্তরে উপনীত হন। অতঃপর সে দরবেশের ইবাদতের মাধ্যমে সকল আনুগত্য হয় একান্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। যাতে থাকে না কোনো প্রতিদান পাওয়ার বাসনা বা আশা পূরণের আকাঙ্ক্ষা।[১৩]

তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের আরেক বড়ো নজির তাঁর সাথে সাথে বাংলায় আগমন করা ৩৬০ আউলিয়া। তৎকালীন পৃথিবীতে বিখ্যাত দরবেশ হিসেবে তাঁর পরিচিতি বেশ জোড়ালো না থাকলে ৩৬০ জন দরবেশ তাঁর পিছে পিছে বাংলায় চলে আসার কথা নয়। শুধু যে বাংলায় এসেছেন তাও নয়; বরং রীতিমতো তাঁর সাথে ভূমি জয়ে অংশ নিয়েছেন তথা তরবারি হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

হজরত শাহজালার সিলেট আগমনের প্রাক্কালে সিলেট ও বাংলার অবস্থাঃ

সিলেটে হজরত শাহজালাল'র আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলের রাজনীতিতে ছিল মিশ্র অবস্থা। বর্তমান রাজশাহী, রংপুর থেকে শুরু করে সোনারগাঁয়ের বড়ো অংশ মুসলমানদের অধীনে এলেও পূর্বাঞ্চল ছিল হিন্দুদের অধীনে। তবে একক কোনো শাসক সেখানে ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে অনেকেই শাসন করতো। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলের (১৪৯৩-১৫১৯) এক শিলালিপি থেকে জানা যায়, শাহজালাল সিলেট জয় করেন ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে।[১৪] এর আগেই সিকান্দার গাজি কয়েকবার সিলেট আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন।[১৫] বাংলার রাজধানী তখন লখনৌতি। শাসক ছিলেন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ। তাঁর অধীনেই সিকান্দার গাজি শাসন করতেন সোনারগাঁ এবং আশপাশের অঞ্চল।[১৬] সিলেট তখন তিনটি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত– লাউড়, গৌড় ও জৈন্তা। লাউড়ের সীমানা ছিল বর্তমান সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের পূর্বাংশজুড়ে। বর্তমান সিলেট শহরের মূল ভূখণ্ড ছিল গৌড়ের অংশ। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এ-কারণেই রাজা গোবিন্দকে 'গৌড় গোবিন্দ' বলা হতো।

যাই হোক, লাউড় আর গৌড় মিলিয়ে সিকান্দার গাজি অনেকগুলো অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু বৃষ্টিবহুল অঞ্চল আর জলাবদ্ধ ভূমি হওয়ায় সিকান্দার গাজির কোনো অভিযানই তেমন আলোর মুখ দেখেনি। বিশেষত এ অঞ্চল প্রাচীনকালে বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি জলাবদ্ধ ভূমি ছিল। ইবনে বতুতা তো বিস্তৃত সুনামগঞ্জ এবং সিলেটের পশ্চিমাংশের হাওর দেখে এটিকে সাগর বলে ভুল করেছেন। তারপরও সিকান্দার গাজির অভিযানগুলোকে একেবারে নিরর্থক বলার অবকাশ রাখে না। কারণ, তাঁর এসব অভিযান এসব অঞ্চলের রাজাদের রাজ্যের ভিত মজবুত করতে যথেষ্ট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি এসব অঞ্চলের রাজাদের তটস্থ রেখেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে সিলেট জয় সহজতর হয়ে ওঠে। আর এ উদ্দেশ্যেই তাকে সোনারগাঁয়ের ভার দেওয়া হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম।[১৭]

গৌড়ের সৈয়দ বুরহান উদ্দিন (রহ.)'র পরিবারের সাথে ঘটে যাওয়া নির্মম ঘটনা এই কথার ইঙ্গিত দেয় যে, সিলেট বিজয়ের পূর্বেও লাউড় কিংবা গৌড়ে কোনো কোনো মুসলিমের আবাসন ছিল এবং তাঁদের জীবনযাপন মোটেও সুখকর ছিল না। এসব মুসলমানদের জীবনযাত্রা সুগম করতে সিকান্দার গাজির এসব অভিযান বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এছাড়া গরুকে কেন্দ্র করে বাংলা অঞ্চলের যে রাজনীতি, সেটি যে একদম প্রাচীনকাল থেকেই বা এই অঞ্চলে মুসলমানদের আগমনের পর থেকেই, তা সৈয়দ বুরহান উদ্দিন'র ঘটনা থেকে পরিষ্কার। পুত্রের আকিকায় গরু জবেহকে কেন্দ্র করে রাজা গৌড় গোবিন্দ যে শাস্তি তাঁর উপর আরোপ করেছিল, তা বাংলার ইতিহাসেরই অন্যতম নির্মম ঘটনা। শিশুপুত্রকে টুকরো টুকরো করা কিংবা বুরহার উদ্দিন'র হাত কেটে দেওয়ার ঘটনারই প্রতিক্রিয়া ছিল সিকান্দার গাজির গৌড় তথা সিলেট আক্রমণ।[১৮] যদিও তিনি প্রাথমিকভাবে সফল হননি। পরবর্তীতে তাঁর বাহিনীর সাথে সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার'র বাহিনীর সংযোগ এবং তাতে হজরত শাহজালাল'র অকুণ্ঠ সমর্থন এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে সহজেই সিলেট অঞ্চল বিজিত হয়।[১৯]

---

[১৩] আওয়ারিফুল মায়ারিফ: ইমাম শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি রহ., উর্দু অনুবাদ: হজরত শামস ব্রেলভি, পৃষ্ঠা ৭৪১

[১৪] সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬

[১৫] জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল: স্টেপলেটন, ১৯২২, পৃষ্ঠা ৪৪১

[১৬] বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭): আবদুল করিম, বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৫০

[১৭] প্রাগুক্ত

[১৮] আমাদের সূফীয়ায়ে কেরাম: দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১৫৩

[১৯] হযরত শাহ জালাল (রহ.): শামসুল আলম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৮৮-৯৫

রাজনীতিতে হজরত শাহজালাল

হজরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট অঞ্চলের রাজনীতিতে ঢুকে পড়েন গৌড় গোবিন্দের সাথে ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে। যে যুদ্ধে তাঁর ডানে ছিলেন সিকান্দার গাজি, বামে সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার (রহ.)। এই যুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে শাহ জালালের জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের সামনে উঠে আসে। প্রথমত, সুফিদের নিয়ে এক শ্রেণির মানুষের ধ্যানধারণা যে, তাঁরা যুদ্ধ বা জিহাদ-বিরূপ। যতই আঘাত বা আক্রমণ আসুক না কেন, সুফিরা যুদ্ধে কিংবা জিহাদে আগ্রহী নয়। এই ধারণাকে শাহজালাল পরিপূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্বদানের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে তিনি এটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, সুফিরা নিজ থেকে আক্রমণ না করলেও মুসলমানদের উপর যদি আক্রমণ আসে, তখন সুফিরা প্রতিআক্রমণে যেতে পিছপা হন না। তাঁরা সর্বাবস্থায় খানকায় বসে তসবিহ জপেন না; জুলুম ভারী হয়ে এলে জালেমের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়েও পড়েন। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনার মাধ্যমে হজরত শাহজালাল'র রাজনৈতিক সচেতনতার বিষয়টিও উঠে আসে। কেননা, গৌড় গোবিন্দ যদি এই ঘটনার পরও পার পেয়ে যেত, সিকান্দার গাজির একাধিক অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর যদি মুসলমানরা দমে যেত, তবে সিলেটে গৌড় গোবিন্দের স্বৈরাচারী মনোভাব দিনদিন বৃদ্ধি পেত; ফলে, সিলেট মুসলমানদের অধিকারে আসা কিংবা সেখানে ইসলামের প্রচার-প্রসারও অন্তত কয়েক'শ বছর পিছিয়ে পড়তো। হজরত শাহজালাল'র এই পদক্ষেপ এ-কথার অকুণ্ঠ সমর্থন দেয় যে, রাজনৈতিকভাবে সুফিরা সর্বদা বিমুখ কিংবা অসচেতন নন, বরং সময়ের প্রয়োজনে তাঁরা কখনো তসবিহ কখনো তরবারি হাতে তুলে নেন।

হজরত শাহজালাল'র আধ্যাত্মিক শক্তির প্রেরণা এবং সিকান্দার গাজি আর নাসির উদ্দিন সিপাহসালার'র যৌথবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য মনোভাবের ফলে সিলেট জয়ের পর বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হয়। প্রথমত, রাজসিংহাসনের প্রতি তাঁর নির্লিপ্ততা, দ্বিতীয়ত রাজকার্যে তাঁর সহযোগিতা, দিকনির্দেশনা। কেননা সিলেট বিজয়ের পর সবাই যখন চেয়েছিল শাহজালাল সিংহাসনে বসুক, তখন তিনি সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছেন সিকান্দার গাজির হাতে। সিংহাসনের প্রতি তাঁর নির্লিপ্ততার আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইতঃপূর্বে বর্ণিত ইয়ামেনের ঘটনা। তাঁর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে ইয়ামেনের এক সামন্ত রাজা যখন মারা গিয়েছিল তখন তাঁর সামনে সুযোগ ছিল সিংহাসনে আরোহণের। কারণ, যুবরাজ শেখ আলী নিজেই শাহজালালের প্রতি মুগ্ধ হয়ে সিংহাসনের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েছিলেন। অপরদিকে শাহজালালের প্রতি ছিল জনসাধারণের সমর্থন। তারা কার্যত চেয়েছিল শাহজালাল সিংহাসনে আরোহণ করুক। কিন্তু তিনি বাংলার দিকে যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। ইয়ামেন আর সিলেট এই ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য বাস্তবতা।

রাজকাজে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে তাঁর নির্লিপ্ততার আরেকটি নজির হচ্ছে সিলেট জয়ের পর ফিরোজ শাহ তাঁকে সিলেট অঞ্চলের নওয়াব হিসেবে মনোনীত করতে চেয়েছিলেন। নওয়াবির সনদসহ একজন আমিরকে পাঠিয়েছিল তাঁর কাছে, কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান তো করেছেনই; উপরন্তু ফিরোজ শাহের আমিরের সাথে দেখাই করেননি। যেমনটি জীবনীকার শামসুল আলমের বইতে এসেছে– "বাঙলার সুলতান ফকির শাহ্ জালাল (রহ.)-এর অলৌকিক ক্ষমতাবলে সিলেট বিজয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে তাঁকে সম্মানিত করার জন্যে সিলেট জেলার নওয়াবীর সনদসহ একজন সম্মানিত আমির সিলেট প্রেরণ করেন। নওয়াব-প্রেরিত আমির ফকির শাহ-জালাল (রহ.)-এঁর বাসস্থান থেকে তিন মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করেন এবং হযরত শাহ জালাল (রহ.)-কে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে নওয়াবীর সনদ গ্রহণ করতে সংবাদ পাঠান। শাহ্ জালাল (রহ.) নবাব-প্রেরিত আমিরের সঙ্গে সাক্ষাত করেননি। আমির শাহ জালাল (রহ.)-কে সিলেট শহরের জায়গীর-দারী গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। হযরত শাহ্ জালাল (রহ.) তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং আমিরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে অসম্মত হন। হতভম্ব আমির অগত্যা হযরত শাহ জালাল (রহ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের অনুমতি প্রার্থনা করেন কিন্তু তাও অস্বীকৃত হয়। অতঃপর তিনি শহরকে কসবে সিলেট বা নিষ্কর সিলেট ঘোষণা করে প্রস্থান করেন।"[২০]

আবার তিনি সরাসরি শাসনকার্যে জড়িত না হলেও শাসনকার্যে যোগ্য ব্যক্তিতে নিযুক্ত করতেন। যিনি নিযুক্ত হতেন তাঁরও সার্বিক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। কেননা তাঁর নির্দেশে সিকান্দার গাজি শাসনকার্যে নিযুক্ত হবার পর প্রতি সপ্তাহে একদিন শাহ জালালের আস্তানায় গিয়ে রাজকার্যের বিষয়ে নানান পরামর্শ করতেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁদের মাঝে একান্তে আলোচনা হতো। যেমনটি শামসুল আলম রচিত *হযরত শাহ জালাল (রহ.)* বইতে এসেছে, "রাজা গৌড় গোবিন্দের পরাজয়ের পর হযরত শাহ জালাল

[২০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮

(রহ.)–এঁর নির্দেশেই তিনি সিলেটের শাসনভার গ্রহণ করেন। সপ্তাহে একদিন তিনি শাহ জালাল (রহ.)–এঁর কাছে গিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে ফকিরকে অবহিত করতেন এবং ফকিরের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।"[২১]

বলাবাহুল্য শাহজালাল'র আস্তানায় সমাজের উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্তের সকল মানুষের অবাধ যাতায়াত ছিল। তাঁর দরবারে যেতে সচরাচর কেউ সংকোচবোধ করতো না। ইবনে বতুতার বর্ণনায় দেখা যায়, শাহজালালের লঙ্গরখানায় গিয়ে মানুষ ধর্মপরিচয়ের কারণে কখনো আহার বঞ্চিত হতেন না। এ থেকে শাহজালালের প্রজ্ঞার সাথে আমরা পরিচিত হই। কারণ, তিনি যদি সরাসরি সিংহাসনে আরোহণ করতেন, তবে তাঁর আশপাশে রাজভৃত্যদের আনাগোনা সারাক্ষণ লেগে থাকতো। ফলে তাঁর যে মূল মিশন তথা "তুমি ভারত খণ্ডের পূর্ব সীমায় ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীন করিবে এবং স্বীয় কীর্তি চিরস্মরণীয় করিবে"–এই লক্ষ্য হাসিল করতে পারতেন না। কেননা লোকেরা ভেবেই নিতো যে, এই বিদেশি দরবেশ আমাদের শাসন করতেই এখানে এসেছেন। শাসকের চেয়ারে না বসাতে লোকেরা ভাবতে পেরেছে, তিনি সিংহাসনের লোভে সিলেট জয় করেননি; বরং জালিম গৌড় গোবিন্দের জুলুম থেকে তাদেরকে মুক্ত করতেই তাঁর আগমন। ফলে যতই দিন যেতে থাকে, সিলেটের আপামর জনসাধারণ তাঁর আস্তানায় ভিড় বাড়াতে থাকে। কেননা তাঁর কার্যক্রমেও তারা কোনো জোরজবরদস্তি খুঁজে পায়নি। ধর্মত্যাগে কাউকে কোনো অবস্থাতেই বাধ্য করা হয়নি। মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে ভেতর থেকে পরিশুদ্ধ করার প্রতিই তাঁর সমস্ত মনোযোগ। দুটি উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট।

১. দীনকান্ত চক্রবর্তী সাহিত্যসিন্ধু লিখেছেন, "পীর শাহজালাল'র গুণগানে বিমোহিত হইয়া বহু হিন্দু ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোবিন্দ দেবের আত্মীয়-স্বজনও স্বধর্ম পরিত্যাগ করিল, এমনকি লাউড়ের ব্রাহ্মণ রাজ পরিবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া অতঃপর রাজা স্থলে 'রেজা' উপাধিতে সম্মানিত হইলেন। "[২২]
২. সুরেন্দ্রকুমার দাস চৌধুরী তাঁর লিখেছেন, "হজরত শাহ জালাল এবং তদীয় অনুসঙ্গীগণের মধ্যে কেহ কখনো কোন অবস্থায় হিন্দু দেবদেবীর প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় নাই। শ্রীহট্ট বিজয় অসী সাহায্যে সম্পন্ন হয় নাই। পাশবিক বলপ্রয়োগের কোন নিদর্শন কোথাও নাই। হযরতের অনুসঙ্গীরা প্রায়শ নির্জন বনভূমিতে বাস করিয়া ইসলাম জপ করত কালাতিপাত করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ তপঃসিদ্ধির প্রভাবে শত্রু-হৃদয় জয় করিয়া বিনা রণে বিনা রক্তপাতে শ্রীহট্টে ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"[২৩]

শত্রু হৃদয় জয় করে ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্য শাহজালাল সরাসরি রাজকার্যে অংশগ্রহণ না করলেও রাজকার্যে যে তিনি পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন তার আরেক প্রমাণ সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার'র তরফ বিজয় এবং শাসন। নাসির উদ্দিন সিপাহসালার যেমনিভাবে সফল সেনাপতি, তেমনি শাহজালাল'র সুযোগ্য খলিফা। তাঁর দরবেশি জীবন বরং সৈনিক জীবনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তাঁর বিশেষ অনুসারী বারোজন আউলিয়ার কথা সুপ্রসিদ্ধ। তরফ বিজয়ে এই বারো দরবেশের বিশেষ ভূমিকা এবং ঐ অঞ্চলে পরবর্তীতে ইসলাম প্রচারে তাঁদের অবদানের কথা সগৌরবে লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া, সিলেট জয়ের ক্ষেত্রে নাসির উদ্দিন সিপাহসালার'র ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কারণ, এই যুদ্ধে এমন এক মুহূর্ত এসেছিল, যখন একটি ধনুকে সুতা স্থাপন করাতেই যুদ্ধ জয় নিশ্চিত হতে পারে। গৌড় গোবিন্দের অস্ত্রাগারে বহু পুরোনো জাদুকরী ধনুকে কেউই জ্যা করতে তথা সুতা স্থাপন করতে পারতো না। রাজতান্ত্রিকদের পরামর্শে গোবিন্দ ঘোষণা দিয়েছিল– শাহজালালের বাহিনীর কেউ যদি ঐ ধনুক জ্যা করতে সমর্থ হয়, তবে আর কোনো যুদ্ধই হবে না, গোবিন্দ আত্মসমর্পণ করবে। এমতাবস্থায় পুরো বাহিনীতে শাহজালাল এমন এক ব্যক্তির খোঁজ করেছিলেন, যাঁর কোনোদিন আসরের নামাজ কাজা হয়নি। পরিশেষে দেখা গিয়েছিল, বাহিনীতে কেবল একজনই এমন আছেন এবং তিনি সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার।[২৪]

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার যতটা না রণদক্ষ, তারচেয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অনেক বেশি। কিন্তু তরফ বিজয়ের পর হজরত শাহজালাল'র পরামর্শে তিনি তরফের সিংহাসনে বসেন এবং রাজকার্য পরিচালনা করেন।[২৫] এ-ছাড়াও শাহজালাল একবার সিলেটের পূর্বে বর্তমান ভারতের কাছাড় অঞ্চলে নরবলি প্রথা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অভিযানে গিয়েছিলেন।

---

[২১] আল ইসলাহ: শাহ জালাল সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৯, (বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে শাহ জালাল (রহ.)–এঁর সিলেট আগমন: শামসুল হক)
[২২] মাসিক শ্রীভূমি ১৩২২ বাংলা সংখ্যা: দীনকান্ত চক্রবর্তী সাহিত্যসিন্ধু, পৃষ্ঠা ৩১১-৩১২
[২৩] শাহ জালালের মাটি: সুরেন্দ্রকুমার দাস চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৩৩
[২৪] হিস্ট্রি অব শাহ জালাল অ্যান্ড হিজ খাদিমস: মুফতি আজহার উদ্দিন সিদ্দিকী, ১৯১৪, পৃষ্ঠা ২৬
[২৫] খান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬

এই অভিযানে নরবলি প্রথা বন্ধের পাশাপাশি সেখানে বেশ কয়েকজনের হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে এসেছেন। যেমন, বদরপুরে হজরত বদরকে, হাজি সৈয়দ গোলাম নবীকে লঙাইতে, হজরত খাজা কামাল উদ্দীন এগারশতীকে মোবারকপুরে, শাহ জিয়াউদ্দীনকে বুন্দাশীলে, মীর আরেফিন ও হজরত আদম খাকীকে সিলেট-কাছাড়ের বর্ডারস্থ দেওড়াইলের চাপড়া মৌজায়, খাজা সৈয়দ আবদুল মুনিমকে মনাঙ্গনে দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।[২৬] দেখা যাচ্ছে, তিনি সরাসরি শাসনভার গ্রহণ না করলেও কার কাছে শাসনভার ন্যস্ত হলে তা যথাযথভাবে পালন হবে তা ভালোভাবেই জানতেন। এবং সে অনুযায়ীই যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। সবমিলিয়ে, তিনি সিলেটের কেন্দ্রে বসে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করতেন। একদিকে প্রশাসক নিযুক্তি, অপরদিকে বিভিন্ন জনপদে টিলায় টিলায় তাঁর খলিফারা অবস্থান করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

জীবদ্দশায় হজরত শাহজালাল'র এমন বহুমাত্রিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুফল তাঁর ইন্তেকালের পর শত-শত বছর ধরে জারি থাকে। এই বাংলার জমিনে রাজা-বাদশাদের অনেকেই, বিশেষত সিলেট অঞ্চলের শাসকরা তাঁদের রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করতেন তাঁর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে। 'শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি' বইতে এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, "শ্রীহট্ট জেলার মুসলমান শাসনকর্তাগণ বাদশাহি আমল হইতেই নানাভাবে শাহজালালের দরগার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। যখনই কোন রাজপুরুষ শ্রীহট্টের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া এ অঞ্চলে আসিয়া পৌঁছিতেন, কার্যভার গ্রহণ করার পূর্বেই তিনি দরগাহ জিয়ারত ও দরগার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে সর্বপ্রধান কার্য বলিয়া মনে করিতেন। কারণ দরগার খাদিমগণ কর্তৃক অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণ তাঁহাকে শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকার করিতেন না। রাজপুরুষ রাজকীয় আড়ম্বরে দরগায় আসিয়া পৌঁছিতেন, খানকার শেখ তাঁহার মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহার প্রতি হজরত শাহজালালের মনোনয়ন জ্ঞাপন করিতেন। অনন্তর কিছু দান খয়রাত করার পর খাদিমগণ কর্তৃক শ্রীহট্টের গদিতে অভিষিক্ত হইতেন। এই প্রথা ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভের দিকে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।"[২৭] বর্ণনায় ব্রিটিশ আমলের প্রারম্ভ পর্যন্ত এই ধারা জারি থাকার কথা এলেও, এ ধারা আজও চলমান। যার প্রত্যক্ষ উদাহরণ রয়েছে আমাদেরই জীবনে। যদিও বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিংহাসনে বসার পর শাসকের ভিন্ন চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

হজরত শাহজালালের জীবন নিয়ে সার্বিক আলোচনা করলে দেখা যায়– একদিকে তিনি গরিব-দুঃখী মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে আধ্যাত্মিক রাজত্ব করেছেন, অপরদিকে সিলেট এবং আশপাশের অঞ্চলে তাঁর শাগরেদদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন। একদিকে তাঁর লঙ্গরখানায় পীড়িত, নিষ্পেষিত, অভুক্ত মানুষরা এসে ক্ষিধে মিটিয়েছেন, অপরদিকে মানুষের অন্তরে আধ্যাত্মিক প্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের পথে নিয়ে এসেছেন। একদিকে তিনি সিংহাসন ছেড়ে মানুষ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, অপরদিকে শাসকের আসনে যেন স্বৈরাচার চেপে না বসে, জালিমের হাতে যেন ক্ষমতা না যায়, সেটাও নিশ্চিত করেছেন। 'মুজাররদ' গুণে গুণান্বিত তথা আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়া-আখিরাতে সমস্ত চাওয়া-পাওয়া থেকে খালি হওয়ার পরও একদিকে তরবারি হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, অপরদিকে মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করা, সেইসাথে নিজের আওতায় থাকা শাসকদের যথাযথ দিকনির্দেশনা দিয়ে যাওয়া এক অনন্য উচ্চতর সাধকেরই দৃষ্টান্ত। একদিকে সুফি-দরবেশ হিসেবে সমাসীন, অপরদিকে রাজনৈতিক উপদেষ্টা– একনিষ্ঠ খোদামুখী দরবেশ হয়েও বিচিত্র এক সত্তা! এই আমাদের শাহজালাল– আমাদের আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক রাহবার। তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ যেমন দীপ্যমান সূর্যতুল্য, তেমনি জালিমের বিরুদ্ধে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান এ অঞ্চলের মুসলমানদের লড়াই-সংগ্রামের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস।

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩

[২৭] সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. *The Travels Of Ibn Battuta* (1325-1354, Volume IV): H. A. R. Gibb and C. F. Beckingham, THE HAKLUYT SOCITY, LONDON, 1994

২. *প্রাচ্যসূর্য হযরত শাহজালাল (রহ.)*: আলী মাহমুদ খান, আল-জালাল প্রিন্টার্স, দরগাহ গেইট, সিলেট, ১৯৮৪

৩. *হজরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*: সৈয়দ মুর্তজা আলী, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫

৪. *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি*: মুফতি আজহার উদ্দিন সিদ্দিকী, মদন মোহন কলেজ সাহিত্য পরিষদ, সিলেট, ২০০৮

৫. *ইসলাম প্রসঙ্গ*: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৩

৬. *বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব*: ড. মুহম্মদ এনামুল হক, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬

৭. *জালালাবাদের কথা*: দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

৮. *বা-ঙ্গে দা-রা, নজমে খুদি*: আল্লামা ইকবাল রহ.

৯. *আওয়ারিফুল মায়ারিফ*: ইমাম শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি রহ., উর্দু অনুবাদ: হজরত শামস ব্রেলভি

১০. *জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*: স্টেপলেটন, ১৯২২

১১. *বাংলার ইতিহাস* (১২০০-১৮৫৭): আবদুল করিম, বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

১২. *আমাদের সূফীয়ায়ে কেরাম*: দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫

১৩. *হযরত শাহ জালাল (রহ.)*: শামসুল আলম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮

১৪. *আল ইসলাহ*: শাহ জালাল সংখ্যা

১৫. *মাসিক শ্রীভূমি* ১৩২২ বাংলা সংখ্যা: দীনকান্ত চক্রবর্তী সাহিত্যসিন্ধু

১৬. *শাহ জালালের মাটি*: সুরেন্দ্রকুমার দাস চৌধুরী

১৭. *হিস্ট্রি অব শাহ জালাল অ্যান্ড হিজ খাদিমস*: মুফতি আজহার উদ্দিন সিদ্দিকী, ১৯১৪